কিশোর অপরাধ: বিপথগামীদের ফেরাতে সরকারের নানা উদ্যোগ

মুহঃ সাইফুল্লাহ

কিশোর অপরাধ একটি সামাজিক ব্যাধি। সব দেশে সব সমাজেই এ সমস্যা কমবেশি দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এসব অপরাধকে শিশু-কিশোরদের বৃদ্ধি পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ সমস্যা সে প্রাচীন সমাজ থেকে চলে আসছে। বর্তমান সমাজে মা-বাবা উভয়ের ব্যস্ততা, স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ, সাংসারিক অশান্তি, যৌথ পরিবার ব্যবস্থার বিলোপ, মুক্ত আকাশ সংস্কৃতি প্রভৃতি কিশোর আপরাধ সমস্যাকে তীব্রতর করে তুলেছে। আর গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতির সুবাদে প্রতিনিয়ত চোখের সামানে ভেসে ওঠা অপরিণামদর্শী অপরিণত অপরাধীদের বীভৎস কান্ড রীতিমতো সবাইকে ভাবিয়ে তুলছে।

কিশোর অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষেত্রে অপরাধী প্রকৃত অর্থেই কিশোর কি-না তা নিশ্চিত হতে হয়। শৈশব বয়ঃসন্ধিকাল অতিক্রম করে কৈশোরে পৌঁছায়। কিশোর-কিশোরীদের বয়সসীমা ১৩ থেকে ১৮ বছর। এ বয়সি সবাই জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী শিশু। আর তাই অপরাধে জড়িয়ে পড়া কিশোরদের শিশু হিসেবে বিবেচনা করেই ব্যবস্থা নিতে হয়।

কিশোর অপরাধ বহুবিধ। সহনীয় থেকে অসহনীয় মাত্রা পর্যন্ত। এসব অপরাধের মধ্যে রয়েছে--স্কুল পালানো, পরীক্ষায় নকল করা, নিরুদ্দেশ হওয়া, মদ্যপান, ধূমপান, সমবয়সিদের সাথে অযথা মারপিট করা, ইভটিজিং, পর্ণছবি দেখা, বিনা টিকিটে গণপরিবহণে ভ্রমণ, পকেটমার, ছিঁচকে চুরি প্রভৃতি। কিশোর-কিশোরীরা ক্ষেত্র বিশেষে এতই উদ্ধত হয়ে পড়ে যে, তারা সামাজিক বা ধর্মীয় মূল্যবোধ, রীতিনীতিকে তোয়াক্কাই করে না। এমনকি তারা দেশের আইন- কানুনকেও বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে। কিশোর গ্যাংদের ভয়ঙ্কর অপরাধীদের মতো হত্যা, ধর্ষণ, গুম, চুরি-ডাকাতি, মাদক পাচার, প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে জড়িয়ে পড়তেও দেখা যায়।

কেন কচি মনের কিশোর-কিশোরীরা এ ধরনের অসামাজিক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়? কেন কিশোর-কিশোরীরা এতটা বিধ্বংসী হয়? এ বয়সে তারা বেশ কিছু শারীরিক, জৈবিক ও মানসিক পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে যায়। বয়ঃসন্ধিকালীন বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন হরমোন তাদের অস্থির করে তোলে। এ বয়সে তারা যুক্তি গ্রাহ্য না করে আবেগতাড়িত হয়। তারা বাস্তবতাকে এড়িয়ে সবসময় স্বপ্নে বিভোর থাকতে চায়। অসহনীয় সামাজিক চাপও কিশোরদের বিভিন্ন অপরাধে ঠেলে দেয়। লেখাপড়ার অতিরিক্ত দখল সামলাতে না পারা, দারিদ্র্য, মা-বাবা বা অভিভাবকের নিষ্ঠুর শাস্তি, এমনকি পরিবারের মাত্রাতিরিক্ত প্রাচুর্যও তাদের বিপথগামিতার কারণ হতে পারে। মা-বাবার উদাসীনতা এমনকি, তাদের অতিরিক্ত আদর-যত্নও সন্তানদের বিচ্যুতি ঘটাতে পারে।

কিশোর অপরাধী ও পূর্ণবয়স্ক অপরাধীর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। পূর্ণবয়স্ক অপরাধীরা নিজেদের স্বার্থ বা হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে অপারাধমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। আর কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা সাধারণত আগপিছ না ভেবে আবেগতাড়িত হয়ে বা তাদের চারপাশের পরিবেশ বিশেষ করে সঙ্গী-সাথীদের প্ররোচনায় অপরাধে জড়ায়।

আর তাই কিশোর-কিশোরী অপরাধীরা বিচার প্রক্রিয়ায় বেশ কিছু সুবিধা ভোগ করে থাকে। বিচারিক আদালত, অনুসৃত দন্ডবিধি, দন্ডভোগ প্রক্রিয়া-সবক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের তুলনায় অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের জন্য বেশ কিছু নমনীয়তা রয়েছে। একইভাবে কিশোর অপরাধীদের জামিন প্রক্রিয়াও সহজ। গুরুতর কোনো অপরাধে জামিন দেওয়া না গেলে কিশোর অপরাধীকে জেলে না রেখে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখতে হবে। দুর্ধর্ষ কোনো কিশোর অপরাধীকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে তাকে জেলে পাঠাতে হবে, তবে বয়স্ক দন্ডিত অপরাধীদের সাথে না রেখে তাকে আলাদা ব্যবস্থায় রাখতে হবে। কিশোর অপরাধীদের বিচারে অনুসৃত আইন- শিশু আইন ২০১৩ অনুসারে শিশু আপরাধীদের শাস্তির সর্বোচ্চ সীমা ১০ বছরের কারাদন্ড। রায়ে ঘোষিত কারাবাসের মধ্যে দন্ডিত অপরাধীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে এবং ১৮ বছর পার হয়ে গেলে বাকি দন্ড বয়স্ক দন্ডিত অপরাধীর ন্যায় জেলে কাটাতে হবে। আইন অনুযায়ী কিশোর আপরাধীদের আজীবন কারাদন্ড বা মৃত্যুদন্ড দেওয়ার বিধান নেই। এমনকি আদালতে বিচার প্রক্রিয়ার যে কোনো পর্যায়ে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার মিটমাট করা যাবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশু-কিশোরীদের বিকাশে শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করেছিলেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের অনুসরণে শিশু আইন ১৯৭৪-কে আরো যুগোপযোগী করে শিশু আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেন। জাতিসংঘ বেঁধে দেওয়া বয়সসীমার প্রেক্ষিতে শিশুদের (১৩ বছর পর্যন্ত) পাশাপাশি কিশোররাও (১৩ থেকে ১৮ বছর) এ আইনের

আওতায় পড়ে। আর তাই কিশোর কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের তদন্ত ও বিচার, রায়ে ঘোষিত দন্ড কার্যকর করা, অপরিণত অপরাধীদের সংশোধনের মাধ্যমে মূলধারায় ফিরিয়ে আনাসহ সমাজে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের যাবতীয় কার্যক্রম শিশু আইন ২০১৩-তে উল্লেখ করা হয়েছে। এ আইনের আলোকে দেশের সকল থানায় শিশুদের বিষয় নিয়ে একটি আলাদা ডেস্ক (শিশু বিষয়ক ডেস্ক হিসেবে অভিহিত) খোলা হয়েছে। কিশোর অপরাধ সংক্রান্ত সকল মামলা নিষ্পত্তিতে এ ডেস্ক কাজ করে। একজন পুলিশ কর্মকর্তা (শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে অভিহিত) এ ডেস্কের দায়িত্বে থাকেন। তিনি কিশোর অপরাধীদের মামলা তদারকির ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট আদালতের সাথে সার্বক্ষণিক সমন্বয় সাধন করেন। কিশোর অপারাধ মামলাগুলোর বিশেষ দিক বিবেচনা করে এ ধরনের মামলা নিষ্পত্তিতে শিশু আদালত প্রতিষ্ঠার বিধান রাখা হয়েছে এ শিশু আইনে। আইনে প্রস্তাবিত এ ধরনের আদালত এখনো দেশে প্রতিষ্ঠা হয়নি। সে প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত আদালত প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কিশোর অপরাধ মামলা নিষ্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে। বর্তমানে সারাদেশে এ ধরনের ১০১টি ট্রাইব্যুনাল নিয়মিতভাবে কিশোর অপরাধ মামলার শুনানি করছে। কোনো জেলায় এ ট্রাইব্যুনাল না থাকলে সে জেলার জেলা ও দায়রা জজ নিজেই কিশোর আপরাধ মামলার শুনানি করেন।

শিশু আইন ২০১৩-তে বলা হয়েছে, শিশু আদালত অপরাধ জামিনযোগ্য না হলেও জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই কিশোর অপরাধীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারবে। এ আইনে কোনো মামলায় কিশোর অপরাধী গ্রেফতারের ক্ষেত্রে তাকে হাতকড়া পরানো যাবে না বা কোমরে রশি দিয়ে বাঁধা যাবে না। ভয়ভীতি দূর করতে শিশু-আদালতে কাঠগড়া, লালসালু ঘেরা আদালত কক্ষ প্রভৃতি পরিহার করতে হবে, আদালতে উপস্থিত পুলিশ সদস্য, আইনজীবী ও অফিসিয়ালদের নির্ধারিত ইউনিফর্মের পরিবর্তে ইনফরমাল পোশাক পরতে হবে। মামলার শুনানিতে রূঢ় ভাষা বা শিশুসুলভ নয় এমন ব্যবহার পরিহার করতে হবে। শিশু-আদালত আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিশোর সম্পর্কে ‘অপরাধী’ ‘দন্ডিত’ বা ‘দন্ডাদেশ’ প্রভৃতি কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে পারবে না। আদালতকে শিশু আইনে ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করতে হবে। মামলার শুনানিকালে মা-বাবা, অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন অভিযুক্ত শিশু-কিশোরদের সাথে আদালতে উপস্থিত থাকতে পারবেন। মামলায় জড়িত শিশু-কিশোরদের ছবি বা মানহানিকর সংবাদ গণমাধ্যমে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যাবে না।

শিশু-কিশোরদের সঠিকভাবে গড়ে তোলাসহ অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রাখতে দেশব্যাপী ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে সরকার। এ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও নীতি যুগোপযোগী করা হয়েছে। মাতা-পিতা ও অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে অনাথ শিশুদের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হয়। এসব শিশুর খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করে সরকারি শিশু পরিবার, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, ছোটমণি নিবাস প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে আট হাজার ক্লাব শিশু-কিশোরদের নিয়ে কাজ করছে। অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের সংশোধনের বিষয়টি এসব ক্লাব গুরত্ব দিয়ে থাকে। বর্তমানে আইনি প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বা আদালতের আদেশে দন্ড ভোগরত এক হাজার একশো’র বেশি কিশোর-কিশোরীকে চারটি উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। এর মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত গাজীপুরের টঙ্গী ও যশোরের পুলেরহাট জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে নয়শো’র বেশি কিশোরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের দুশো’র মতো কিশোরীকে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে জয়দেবপুরের জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পর্যায়ে শিশু কল্যাণ বোর্ড শিশু-কিশোরদের বিপথগামিতা রোধসহ তাদের সার্বিক কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তদারক করে থাকে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে শিশু কল্যাণ বোর্ড একই ধরনের দায়িত্ব পালন করে।

কিশোর অপরাধ সমস্যা প্রতিকারে পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, নিয়মিত কাউন্সিলিং, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ লালন এবং সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন শিশু-কিশোরদের সব ধরনের অপরাধ থেকে দূরে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মা-বাবা, অভিভাবক ও পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা। শিশু-কিশোররা কোথায় যাচ্ছে, কার সাথে মিশছে- প্রভৃতি সবসময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। শাসনের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের আবেগ অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের কথা শুনতে হবে। পরিবারের অপরিসীম ভালোবাসা ও যত্নে আজকে একজন কিশোর অপরাধী হয়ে উঠতে পারে আগামীকালের সুযোগ্য নাগরিক।

ফিচারের লেখক মুহ: সাইফুল্লাহ, তথ্য অধিদফতরে সিনিয়র উপপ্রধান তথ্য অফিসার হিসেবে কর্মরত।

১৮.০৮.২১ (পিআইডি ফিচার)